

জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালা : পনেরো

ওষুধ থেকে অসুখ

ডাঃ কৃষ্ণাংশু রায়

নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন

শুভেচ্ছা

অন্ন, বস্ত্র, আশ্রয় এবং শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত কোটি কোটি ভারতবাসী তাঁদের স্বাস্থ্যের মৌলিক অধিকারটুকু পান নি। স্বাস্থ্যহীনতা, রোগ-ভোগ ও অকাল মৃত্যু দেশ জুড়ে ছড়িয়ে আছে এবং জাতির বড় অংশকে পঙ্গু করে রেখেছে। স্বাস্থ্য রক্ষার ন্যূনতম সাধারণ নিয়মগুলি সম্বন্ধে সচেতনতার অভাব এই সমস্যাকে আরও জটিল করে তুলেছে। এ বিষয়ে যদি সাধারণ মানুষকে অবহিত ও আগ্রহী করে তোলা যায় তাহলে সমাজের অনেক দুর্বলতা দূর হবে।

'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন' সমাজবোধের তাগিদে এই কাজ নিজেদের কাঁধে তুলে নিয়েছেন। বিজ্ঞানসম্মত নানাবিধ কর্মসূচীর মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে তাঁরা তাঁদের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে তাঁরা জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালার যে কটি সংখ্যা প্রকাশ করেছেন সেগুলি অত্যন্ত উপযোগী হয়েছে। স্বাস্থ্য রক্ষার বিভিন্ন বিষয়গুলি প্রাঞ্জল ও চিত্তাকর্ষক ভাবে আলোচিত হয়েছে। এই সংস্থার পরিচালকদের সামগ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি আছে। তাঁরা জনস্বাস্থ্য সমস্যাটিকে সমাজের অন্যান্য সমস্যা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখছেন না। মাধ্যমিক স্তরে স্বাস্থ্য শিক্ষাকে আবশ্যিক করার যে নীতিগত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে এঁরাই প্রথম সে দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন।

রোগ নিরাময়ের ক্ষেত্রে যথাযথ পরামর্শের ভিত্তিতে ওষুধের ব্যবহার অপরিহার্য। কিন্তু নির্বিচারে ওষুধ প্রয়োগের ফল অনেক সময় ক্ষতিকর, এমনকি মারাত্মক হয়ে দাঁড়ায়। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় তথ্যসহ সতর্কতা সঞ্চারিত করার জন্য বর্তমান পুস্তিকাটি 'ওষুধ থেকে অসুখ' প্রকাশিত হচ্ছে। এই আলোচনার বাস্তবমূল্য অপরিসীম।

প্রাণপণে পৃথিবীর জঞ্জাল সরিয়ে এই বিশ্বকে নবজাতকের বাসযোগ্য করে তোলার অঙ্গীকার উচ্চারণ করে গেছেন কিশোর কবি। আমাদের দেশটাকে আমাদের আগামী প্রজন্মের বাসের উপযোগী করে তোলার শপথ আমাদের সকলকে নিতে হবে। সেই লক্ষ্যে পরিচালিত 'নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন'-এর সমস্ত কর্মসূচীর প্রতি আমার আন্তরিক অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। সেই সঙ্গে সম্ভাব্য সহযোগিতার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।

জুন 2, 1988

রঞ্জুগোপাল মুখোপাধ্যায়
সভাপতি
পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদ

আমাদের কথা

অগণিত বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ী জেনে খুশী হবেন, অবশেষে আমাদের একান্ত নিজস্ব একটি আস্তানা মিলেছে—157-সি, আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রোড, কলিকাতা-৬ (খান্না সিনেমা বিল্ডিং ; টেলিফোন ঃ 54-4659)। অতঃপর এখানেই আমাদের নিয়মিত সাক্ষাৎ মিলবে। এই সঙ্গে সংস্থা নতুন একটি প্রচেষ্টাও শুরু করছে। আমরা এতাবৎ অনৈতিক চিকিৎসা বিষয়ে যে সব কথা বলেছি নির্বিচার ওষুধ ব্যবহারের বিরুদ্ধে যে সব বক্তব্য রেখেছি, সার্বিকভাবে আমাদের সেসব বক্তব্য কাজে রূপায়িত করার জন্য নৈতিক ও বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসার ব্যবস্থা রাখছি এইখানে। এজন্য সকালে সন্ধ্যায় নির্দিষ্ট সময়ে আমাদের চিকিৎসকরা এই ঠিকানাতে স্বল্প দক্ষিণায় রোগী দেখবেন, যথাযথ পরামর্শ দিয়ে রোগীদের সহায়তা করবেন। সন্ধ্যা 6টা থেকে 9টা অবধি চিকিৎসক এখনই বসছেন, সকাল ও দুপুরবেলার ব্যবস্থাও শিগগীরই করা হচ্ছে। আমাদের যাবতীয় প্রকাশনাও এই ঠিকানায় পাওয়া যাবে।

আমাদের গ্রামীণ মানসিক স্বাস্থ্য প্রকল্পের কাজও এগিয়ে চলেছে। বীরভূম ও বর্ধমান জেলার কয়েকটি জায়গায় মানসিক স্বাস্থ্য আবাসের জমির ব্যবস্থা হয়েছে এবং হচ্ছে। বিশেষজ্ঞদের পরামর্শমতো আমরা গোড়ার দিকে একটি জায়গায় কাজ শুরু করবো—পরবর্তীকালে তা অন্যত্র সম্প্রসারিত হবে। সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষদের সহযোগিতা যে পরিমাণে পাচ্ছি, আমাদের দৃঢ় ধারণা, অদূর ভবিষ্যতেই আমাদের এই প্রকল্প পূর্ণ অবয়ব পাবে।

জনস্বাস্থ্য পুস্তকমালার এবারকার পুস্তিকা 'ওষুধ থেকে অসুখ।' এই 'হরেকরকমবা' চিকিৎসার দেশে ওষুধ থেকে অসুখ ক্রমেই গুরু থেকে গুরুতর হয়ে পড়ছে। অতএব সচেতন হওয়ার সময় এসে গেছে। আমাদের এই পুস্তিকার বক্তব্য আগ্রহী মানুষদের সমস্যাটির বিষয়ে সচেতন করবে বলে আমাদের বিশ্বাস।

3 জুন, 1988

সুখময় ভট্টাচার্য
কর্মসচিব

প্রথম প্রকাশ ঃ 7 জুন, 1988
কার্টুন ঃ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়

ওষুধ থেকে অসুখ

ওষুধ বলতে আমরা বুঝি রোগীর স্বার্থে ব্যবহৃত কোন পদার্থ, যা তার শারীরিক তথা মানসিক অবস্থাকে নিয়ন্ত্রণ বা পরিবর্তন করার জন্য প্রযুক্ত হয়। আরও সহজ করে বলা যায়. অসুস্থ অবস্থা থেকে শরীর ও মনকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য যে জিনিষ ব্যবহার করা হয়, তাই ওষুধ। অনেক রাসায়নিক পদার্থ ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়, যেমন সালফা-গোত্রীয় ওষুধ। অনেক উদ্ভিজ্জ বা প্রাণীজ পদার্থও ওষুধ হিসেবে পাওয়া যায়, যেমন ইনসুলিন, ভিটামিন ইত্যাদি।

ওষুধ সম্পর্কে বিস্তারিত জানবেন চিকিৎসকেরা, কারণ তারাই রোগীর অসুস্থতার প্রকৃতি বিবেচনা করে ওষুধের ব্যবস্থা দেন। তবে ব্যাপক জনগণেরও ওষুধ সম্পর্কে কিছু ধারণা থাকা প্রয়োজন, কারণ তারাই ওষুধের ভোক্তা। অবশ্য এদেশে মোট জনসংখ্যার মাত্র পনেরো থেকে বিশ শতাংশ লোকের ওষুধ খাওয়ার আর্থিক সামর্থ্য আছে। এই এক-পঞ্চমাংশ জনগোষ্ঠীই বছরে যে পরিমাণ ওষুধ ব্যবহার করে, তার বাজারমূল্য দু-হাজার কোটি টাকা। বাজারে যত ওষুধ বিক্রি হয়, তার প্রায় চল্লিশ শতাংশই জনগণ নিজেরা ফার্মেসী থেকে সরাসরি কিনে থাকে।

কোন অসুখ হলেই যে ওষুধ খেতে হবে, এ ধারণা আমাদের মনে বদ্ধমূল হলেও তা সঠিক নয়। **ওষুধে দৈহিক শ্রীবৃদ্ধি হয়, দৈর্ঘ্যে প্রস্থে শরীর বাড়ে, মগজের ক্রিয়া বৃদ্ধি পায়, এসব ধারণাও ভুল।** ডাক্তার-অডাক্তার মহলে ওষুধ সম্পর্কে নানা ভুল ধারণার সুযোগ নিয়ে বিভিন্ন ওষুধ কোম্পানী প্রায় হাজার ষাট ফর্মুলেশান চালু রেখেছে। প্রকৃত বিচারে, এসব ওষুধের প্রায় আশি শতাংশই অপ্রয়োজনীয় বা ক্ষতিকর। কিছু বহুজাতিক সংস্থা নিজের নিজের দেশে নিষিদ্ধ ওষুধও ভারতে নির্বিবাদে বিক্রি করে চলেছে। তারা বেশী মুনাফার স্বার্থে নিষিদ্ধ ও অপ্রয়োজনীয় ওষুধ বেশী তৈরি করে বিজ্ঞাপন ও নানা উপঢৌকনের মাধ্যমে তার বিক্রি বাড়ায়।

প্রতিটি ওষুধের রোগ সারানোর ভূমিকার পাশাপাশি আমাদের দেহ-মনের ক্ষতি করারও কমবেশী ক্ষমতা আছে। **অর্থাৎ ওষুধ কেবল অসুখ সারায়ই না, অবস্থা বিশেষে ওষুধ থেকে নানাবিধ অসুখেরও সৃষ্টি হয়।** এ উপলব্ধি আজকের নয়। দুশো বছর আগে উইলিয়াম উইদারিং বলেছিলেন—'অল্পমাত্রায়

বিষও ওষুধ, আবার বেশী মাত্রায় ওষুধও বিষ'। বর্তমানে ওষুধ বিস্ফোরণের যুগে কারণে অকারণে ওষুধের ব্যবহার বেড়েছে, ফলে ওষুধ থেকে অসুখও হচ্ছে বেশী বেশী সংখ্যায়।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অব্যবহিত পর থেকে ওষুধকে পণ্য করে ব্যাপক মাত্রায় ব্যবসায়িক উদ্যোগের সূচনা হয়। নামী দামী বহুজাতিক ওষুধ কোম্পানী-গুলি ওষুধ গবেষণায় প্রচুর অর্থ ও বৈজ্ঞানিকদের নিয়োজিত করে। তাদের গবেষণাগারে আবিষ্কৃত ওষুধ তারা পেটেণ্ট করে, কোন কোন ক্ষেত্রে নতুন ওষুধের যথাযথ পরীক্ষাদি পর্যাপ্ত মাত্রায় না করেই প্রচুর প্রচার মাধ্যমের সাহায্যে বাজারে ছাড়ে। স্বাভাবিক কারণেই চিকিৎসকদের নতুন ওষুধের প্রতি আকর্ষণ জন্মায় ও ওষুধটি বাজারে চালু হয়ে যায়। দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলস্বরূপ ওষুধটির কিছু কিছু পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কোম্পানী অবহিত হলেও তা ডাক্তারদের কাছে প্রকাশ করে না। এ ছাড়া ভুরি ভুরি উৎকোচের ঘটনাও নতুন নয়। কোন নতুন ওষুধ বাজারে ছাড়তে হলে উৎপাদককে ড্রাগ কণ্ট্রোলার বা ভেষজ নিয়ামকের অনুমোদন পেতে হয়। ভেষজ নিয়ন্ত্রণ বিভাগের কর্তাব্যক্তিরা অনেক ক্ষেত্রে ওষুধ কোম্পানী দ্বারা প্রভাবিত হন। ফলস্বরূপ অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধে বাজার ছেয়ে যায়। অতঃপর এই-সব ওষুধ বিক্রি করতে ওষুধ কোম্পানীগুলি সুচতুর প্রচার মাধ্যমে চিকিৎসক-সমাজে এই ধারণা সৃষ্টি করে যে 'there is a pile for every ill, আমাদের চিকিৎসকেরা যদিও বিদ্যা ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে থাকেন আমাদের দেশেরই দরিদ্র জনতার ক্ষুধার অন্নের বিনিময়ে, তথাপি অনেক সময় তারা ওষুধ কোম্পানীর প্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে বাড়িয়ে তোলেন ক্ষতিকর ও অবৈজ্ঞানিক ওষুধে অসুস্থ রোগীর সংখ্যা।

কোন ওষুধের ব্যবস্থা দেওয়ার আগে চিকিৎসককে কয়েকটি বিষয় বিবেচনা করতে হয়। যেমন—

1) সত্যিই কি ওষুধের দরকার আছে ?
2) যে উপকার কাম্য, তা কি ওষুধের দ্বারা সম্ভব ?
3) নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মাত্রায় ওষুধ প্রয়োগ কি সম্ভব ?
4) ওষুধটি কি মাত্রাতিরিক্ত কোন পার্শ্ব-প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করতে পারে ? এই প্রতিক্রিয়া রোগীর পক্ষে কতখানি ক্ষতিকর ?
5) যদি ক্ষতিকর হয়, তা কি আকাঙ্ক্ষিত সুফলের চেয়ে বেশী না কম ?

শেষোক্ত বিবেচনা থেকেই ওষুধজনিত অসুখ বা 'ইয়াট্রোজেনিক ডিজিজ'-

এর ধারণার সূত্রপাত। ল্যাটিন ভাষায় 'ইয়াট্রস' (Iatros) শব্দটির অর্থ 'চিকিৎসক' এবং 'জেনিক' (Genic) অর্থে 'সৃষ্ট'। অর্থাৎ আক্ষরিক অর্থে ইয়াট্রোজেনিক ডিজিজ হলো ডাক্তারসৃষ্ট ব্যাধি। আমরা আগেই আলোচনা করেছি, ভারতে মোট বিক্রিত ওষুধের চল্লিশ শতাংশ জনগণ নিজেরাই সরাসরি কেনে। অতএব এদেশে ওষুধজনিত অসুখের দায়ভাগ একমাত্র চিকিৎসকদেরই নয়।

ভারতে ওষুধের বাজার:

সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের দেশের দুই-তৃতীয়াংশ অধিবাসী দারিদ্র্যসীমার নীচে বাস করে। তাদের খাদ্য ও পানীয় জলই মেলে না তো ওষুধ। তাই আমাদের দেশে এমন কতকগুলি রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়, যাদের প্রতিবিধান ওষুধ দ্বারা সম্ভব নয়, যেমন অপুষ্টি। এছাড়া আর্থ-সামাজিক অব্যবস্থা ও বৈষম্যের ফলে সৃষ্ট অসুখের, যেমন যক্ষ্মা, কুষ্ঠ, ম্যালেরিয়া, উদরাময় ইত্যাদির, সংখ্যাও কম নয়। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই আশা করা যায় যে বাজারে পর্যাপ্ত পরিমাণে যক্ষ্মার ওষুধ, কুষ্ঠের ওষুধ, ম্যালেরিয়া ও উদরাময়ের ওষুধ পাওয়া যাবে। কিন্তু প্রায়ই সংবাদপত্রে দেখা যায়, উপরোক্ত ওষুধগুলির ঘাটতি চলছে, অথচ টনিক, ভিটামিন, এনজাইমের কোনও ঘাটতি নেই। কারণ শেষোক্ত ওষুধগুলি থেকে কোম্পানীর লভ্যাংশ আদায় হয় অনেক বেশী।

আমাদের দেশে প্রায় ষাট হাজার ফর্মুলেশান আছে, অথচ মূল ওষুধের সংখ্যা মাত্র চারশ। অর্থাৎ কাটতির আশায় একাধিক ওষুধের সংমিশ্রণে (যার অনুমোদন কোন ডাক্তারী বইয়ে নেই) বিভিন্ন ফর্মুলেশান তৈরি হয়ে চলেছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মত অনুযায়ী 200টি মূল ওষুধ দিয়েই মানুষের 95 শতাংশ ব্যাধির মোকাবিলা করা চলে। 1975 সালের 'হাথী কমিটি'-র রিপোর্ট বলছে, মাত্র 117 টি মূল ওষুধই আমাদের দেশের জন্য যথেষ্ট এবং এই ওষুধগুলির নামকরণ করা যেতে পারে 'প্রয়োজনীয় ওষুধ'। অতএব স্পষ্ট বোঝা যায় প্রতিদিন আমরা কত পরিমাণে অপ্রয়োজনীয় ওষুধ সেবন করে থাকি, যা আমাদের অর্থের অপচয়ই ঘটায় না, আমাদের দেহ-মনেরও ক্ষতি সাধন করে।

ওষুধ থেকে কী কী অসুখ হয়?

ওষুধজনিত অসুখের সমস্যাকে এই তিনটি অংশে ভাগ করে আলোচনা করলে সুবিধা হবে—

1. যেসব ওষুধ দীর্ঘদিন ব্যবহারে ক্ষতি হয়,
2. যেসব ওষুধ স্বল্পকাল ব্যবহারে ক্ষতি হয়, এবং
3. যেসব ওষুধ বিভিন্ন দেহাংশের ক্ষতি করে।

যেসব ওষুধ দীর্ঘদিন ব্যবহারে ক্ষতি হয়ঃ

টনিক, ভিটামিন, বলবর্দ্ধক ঃ

প্রথমেই জানা ভালো যে বাজারে যেসব টনিক নামধারী 'ওষুধ' বিক্রি হয়, কোনও প্রামাণ্য পাঠ্যপুস্তকে তাদের নামোল্লেখ নেই, নেই তাদের দাবী-করা উপকারিতা সম্পর্কে কোনও তথ্য। টনিক নামে সাধারণত তিন প্রকারের জিনিষ বাজারে চালু আছে—ভিটামিন টনিক, রক্তবর্দ্ধক টনিক এবং স্বাস্থ্য-বর্দ্ধক টনিক ও দুধের বিকল্প। এই তিনপ্রকার টনিকে রোগীর স্বাস্থ্য কতটুকু ভালো হয় তা সন্দেহজনক। কিন্তু এই তিনটির একটি প্রত্যক্ষ ও তর্কাতীত গুণ হলো, এগুলি উৎপাদক ও বিক্রেতার স্বাস্থ্য ভালো করে, অর্থাৎ তাদের পকেটে প্রভূত অর্থাগম ঘটায়। কোন বিশেষ ভিটামিনের অভাব হলে কেবল সেই ভিটামিনের ব্যবস্থা দেওয়াই তো যুক্তিসংগত। তার জন্য রোগীকে আরও গণ্ডাকয়েক ভিটামিন গিলতে হবে কেন? রক্তাল্পতার জন্য শুধুমাত্র লৌহ ও প্রয়োজনে ফলিক অ্যাসিড ও ভিটামিন বি$_{12}$ দেওয়াই তো যথেষ্ট, বেশী দামের জগাখিঁচুড়ী দেওয়ার যুক্তি কোথায়? আর টনিকই যদি পুষ্টিকর খাবারের বিকল্প হতো তবে জাতীয় স্তরে চাল. ডাল, দুধ উৎপাদন না করে টনিকের কারখানায় দেশ ছেয়ে ফেললেই তো জাতীয় স্বাস্থ্যের শ্রীবৃদ্ধি ঘটতো! সাম্প্রতিককালে টিভিতে চ্যবনপ্রাশের গুণপনা ব্যাখ্যানে দাদু-নাতির বিজ্ঞাপন বা হরলিক্‌সের ডাক্তারবাবুর উপদেশের যা বহর দেখা যাচ্ছে, তাতে আশা জাগে হয়তো বা দু হাজার সালের মধ্যে সকলের জন্য স্বাস্থ্যের ব্যবস্থা এভাবেই আমরা করে ফেলবো!

ভিটামিন সম্পর্কে আপামর জনগণের একটা বিশেষ দুর্বলতা আছে। **পর্যাপ্ত খাদ্য জুটুক না জুটুক, ভিটামিন নিয়ে অনেকেই মাথা ঘামান।** এবং এই দুর্বলতা থেকেই ভিটামিন টনিকের এত কাটতি। জলে দ্রাব্য ভিটামিন অর্থাৎ ভিটামিন বি-কমপ্লেক্স ও সি বেশী খেলে আর্থিক অপচয় হয় বটে, তবে দৈহিক তেমন ক্ষতি হয় না। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ভিটামিন শরীর থেকে প্রস্রাবের মাধ্যমে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যায়। চর্বিতে দ্রাব্য ভিটামিন অর্থাৎ ভিটামিন এ ও ডি কিন্তু দেহে সঞ্চিত হয় এবং ক্রমাগত এই দুটি

ভিটামিন বেশী খেয়ে চললে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ভিটামিন এ বেশী হলে চুল পড়তে শুরু করে, লিভার বাড়ে, চামড়া খসখসে হয় ও ছাল উঠতে শুরু করে, মস্তিষ্কের ভেতরে চাপ বাড়ে। ভিটামিন ডি-র মাত্রাধিক্যে দুর্বলতা, বমিভাব ও বমি দেখা দেয়, রক্তে ক্যালশিয়াম বাড়ে এবং রক্তনালী ও কিডনীতে এই ক্যালশিয়াম সঞ্চিত হয়ে নানা উপসর্গ তৈরি করে।



এটি কি আপনারও সিদ্ধান্ত ! ? !

অনেক টনিকে চল্লিশ পঞ্চাশ শতাংশ অ্যালকোহল বা মদ মেশানো থাকে। উদাহরণ দিচ্ছি—বি. জি. ফস, স্যাণ্টিভিনি, এলিক্সির নিওগ্যাডিন, সিলটোন, ডেক্সোরেঞ্জ, আইবেরল, ভিটাহেক্সট ইত্যাদি। টনিক খেয়ে যতটুকু চাঙ্গা ভাব অনুভব করা যায়, তা টনিকে মিশ্রিত অ্যালকোহলের জন্য এবং রোগী কিছুক্ষণ পরেই আবার ঝিমিয়ে পড়ে। অনেকে ব্যঙ্গ করে বলেন, টনিক না খেয়ে সরাসরি মদ্যপান করলেই তো হয় !

অর্থাৎ অল্পমাত্রার ওষুধের সঙ্গে মদ মিশিয়ে তাতে টনিক লেবেল এঁটে আপনাকে নেশাগ্রস্ত করে দেওয়ার এক সুকৌশল প্রচেষ্টা চলছে দিনের পর দিন এবং এতে করে প্রতিমাসে আপনি নিজেই দোকান থেকে টনিক কিনবেন, খাবেন ও আত্মীয়-পরিজনকে খাওয়াবেন এবং তাতে মুনাফা লুটবে ওষুধ কোম্পানিগুলি।

কোনও কোনও টনিকে মেশানো হয় ক্যাফিন, স্ট্রিকনিন, লেপ্টাজল ইত্যাদি স্নায়ু-উত্তেজক রাসায়নিক পদার্থ। পৃথিবীর কোন সভ্য দেশে

আজকাল পাগলা কুকুর মারতেও স্ট্রিকনিন ব্যবহার করা হয় না, অথচ এদেশে আমাদের অজ্ঞতার সুযোগে আমাদেরই অর্থহানি ঘটিয়ে সে বিষ আমাদের গেলানো হচ্ছে !

আমাদের দেশে বাড়তি ভিটামিন বি$_{12}$ এর প্রয়োজন লাখে একজনেরও হয় না। অথচ প্রচুর ডাক্তার এই ভিটামিন কখনও আলাদা বা কখনও বি$_1$ ও বি$_6$-এর সঙ্গে মেশানো ফর্মুলেশানের ব্যবস্থা দিয়ে থাকেন। দেখা গেছে, প্রচুর দাম দিয়ে কেনা এই মিশ্র ভিটামিন ইনজেকশন অত্যন্ত পীড়াদায়ক। এতে কিছু ক্ষেত্রে এলার্জি হতে দেখা গেছে। এই ইনজেকশানে মৃত্যু ঘটেছে বলেও উল্লেখ আছে।

বয়স্কদের শরীর চাঙ্গা করার অনেক ওষুধ বাজারে আছে, যেমন জেরিয়াটোন, হর্মোজেরোবায়োন, ট্রাইনার্জিক ইত্যাদি। এসব টনিকে ভিটামিনের সঙ্গে হরমোন মেশানো থাকে। এটা আজ আজ অজানা নয় যে হরমোন দীর্ঘদিন সেবনে ক্যানসার হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে।



আপনার কন্যাও কি এই টনিক

শিশুদের মোটাসোটা করার বাসনা প্রতি পিতামাতার মধ্যেই দেখা যায়। এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে হরমোন-জাতীয় ফোঁটা ওষুধের ভুরি ভুরি চলন হয়েছে। ডুরাবোলিন, ডায়নাবল এই ওষুধের উদাহরণ। এগুলির দাম

যেমন অনেক, পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও তেমনি মারাত্মক। দীর্ঘদিন সেবনে শিশুদের আপাত শ্রীবৃদ্ধি হয়, কিন্তু তা স্বাস্থ্যসম্মত বৃদ্ধি নয়। **শিশু কন্যাদের এসব ফোঁটা খাওয়ালে তাদের লিঙ্গান্তর ঘটে, পুরুষত্বের লক্ষণ প্রকাশ পায়।**

টনিকের কবল থেকে মুক্তি পেতে আমাদের জানতে হবে যে পর্যাপ্ত খাদ্য ও তৎসহ কিছু শাকসবজি খেলেই আমাদের পুষ্টির যোগান মেলে। **অপুষ্টির প্রতিবিধান টনিক বা ভিটামিন নয়, পর্যাপ্ত খাদ্য।**

এনজাইম ঃ

দেহের পরিপাক শক্তি অর্থাৎ হজমের ক্ষমতা বাড়ানোর জন্যও রকমারী ওষুধ নিয়ে কোম্পানীগুলি হাজির। এদের কয়েকটি হলো মলজাইম, নর্মোজাইম, অ্যামিনোজাইম, বেণ্টোজাইম প্রভৃতি। এনজাইমগুলি হচ্ছে পেপসিন, প্যাপেইন, ডায়াস্টেজ, লাইপেজ প্রভৃতি। এইসব এনজাইমের অধিকাংশই পাকস্থলীর হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিডে নষ্ট হয়ে যায়, উপকার কী হয় তা তর্কসাপেক্ষ। এগুলি দীর্ঘদিন ব্যবহারে যে হজমশক্তি নষ্ট হয়, অগ্নিমান্দ্য, ডিসপেপশিয়া দেখা দেয়, তা কিন্তু প্রত্যক্ষ সত্য।

ক্ষুধাবৃদ্ধির আর এক মারাত্মক ওষুধ হচ্ছে সাইপ্রোহেপ্টাডিন, যার একটি অতি পরিচিত বাজারী নাম পেরিঅ্যাক্টিন। এটি প্রথমে বাজারে আসে অ্যালার্জির ওষুধ হিসেবে। পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসেবে ওজনবৃদ্ধির ঘটনা জানা গেলে সেটাই ব্যবসায়ের আরও লাভজনক পন্থা বলে ওষুধ কোম্পানীরা বুঝতে পারলো। সাইপ্রোহেপ্টাডিন কিছুদিন ব্যবহারে ওজন কিছু বাড়ে বটে, তবে তার খেসারত হিসেবে মানসিক বিভ্রান্তি, স্মরণশক্তি হ্রাস, অস্থিরতা এবং রক্তের প্লেটলেট কমে গিয়ে অধিক রক্তপাতের সম্ভাবনা বাড়ে।

গ্রাইপ মিকশ্চার ঃ

শিশুরা কান্নাকাটি করে বিরক্ত করে বলে মায়েরা তাদের গ্রাইপ মিকশ্চার খাওয়ান, শিশু ঘুমিয়ে পড়ে আর মা ও সমস্ত পাড়া জুড়োয়। এই লেখক কোন ডাক্তারী বইয়ে গ্রাইপ মিকশ্চারের উল্লেখ পায় নি, পৃথিবীর উন্নত দেশে এটি ওষুধ হিসেবেই স্বীকৃত নয়। গ্রাইপ মিকশ্চারে থাকে খানিকটা মদ, সোডা, চিনি ও সুগন্ধি। **শিশুর উপকার করছেন ভেবে প্রতিদিন কতশত স্নেহশীলা মা তাদের সন্তানের স্নায়ুমন্ডলী মাদকদ্রব্য দ্বারা শিথিল করে চলেছেন।** অপ্রয়োজনীয় মাত্রার সোডিয়াম বাইকার্বোনেটে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে শিশু-দেহের অ্যাসিড-অ্যালকালি সমতা।

হরমোন ঃ

ক) স্টেরয়েড—এই অতীব প্রয়োজনীয় ও জীবনদায়ী ওষুধটি হচ্ছে এ শতাব্দীর এক উল্লেখযোগ্য আবিষ্কার। কিন্তু এর অপ্রয়োজনীয় ও হাতুড়ে ব্যবহারের ফলে বহু রোগী অনেক মারাত্মক প্রতিক্রিয়ার সম্মুখীন হয়ে চলেছে। আশ্চর্যের কথা, আমরা দেখতে পাই অতি বিচক্ষণ ও দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন ডাক্তারবাবুরাও নির্দ্বিধায় অকারণে এই অস্ত্রটি তাঁদের রোগীদের ওপর প্রতিদিন প্রয়োগ করে চলেছেন।

সাধারণ জ্বর কয়েকদিন ধরে উপশম হচ্ছে না, এমন রোগীদের একটি অ্যান্টিবায়োটিকের সঙ্গে দেওয়া হচ্ছে বেটনেলান ট্যাবলেট। এতে সাময়িক-ভাবে জ্বর ছেড়ে গেলেও রোগের লক্ষণের ধরন পাল্টে যাচ্ছে, রোগটি নির্ণয় করা দুরূহ হয়ে পড়ছে। অনেক শিশুরোগ বিশেষজ্ঞদের দেখেছি, প্রত্যেক ব্যবস্থাপত্রেই বেটনেলান ড্রপ পাঁচ ফোঁটা দিনে তিনবার ব্যবস্থা দিয়ে চলেছেন।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, স্টেরয়েড থেকে কী কী ক্ষতি হতে পারে? দেখা গেছে দীর্ঘদিন বা কম সময়ের ফারাকে কিছুদিন করে এই ওষুধ খাওয়ালে দেহে অনাবশ্যক জল জমে হাত-পা ফোলে, মুখ ফুলে চাঁদপানা আকার ধারণ করে, দেহের কাঠামোতে অতিরিক্ত চর্বি জমে, রক্তচাপ বৃদ্ধি পায়, সারা গায়ে ব্রণ, সাদা সাদা দাগ বা কালশিটে পড়ে। আরও গুরুতর প্রতিক্রিয়া হলো মহিলাদের গোঁফদাড়ি গজায়, ঋতুস্রাব অনিয়মিত হয়, শিরদাঁড়ার ভঙ্গুরতা দেখা দেয়, বয়স্কদের বহুমূত্র রোগ হয় এবং আরও অধিকদিন সেবনে চোখে ছানি পড়ে। স্টেরয়েডে শরীরের প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে এবং নানা ব্যাধির আক্রমণের সম্ভাবনা বাড়ে।

খ) জন্মনিরোধক বড়ি ঃ

কণ্ট্রাসেপটিভ পিল বা জন্মনিরোধক বড়ি যা বাজারে কিনতে পাওয়া যায় বা সরকার কর্তৃক পরিবার পরিকল্পনা দপ্তর থেকে বিনা মূল্যে বিতরণ করা হয়, তার উপাদান স্ত্রী সেক্স হরমোন—ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরোন। বাজারে এই পিল বহু নামে ও বিভিন্ন দামে পাওয়া যায় এবং জন্ম নিয়ন্ত্রণে এর নিরানব্বই শতাংশ কার্যকারিতা আছে বলে পরিবার নিয়ন্ত্রণ করার পন্থাগুলির মধ্যে এটি জনপ্রিয়।

এখন কথা হচ্ছে, পিল দীর্ঘদিন সেবন করলে হয়তো জন্মনিয়ন্ত্রণ প্রকল্প সফল হয়, কিন্তু এর অন্য ফলশ্রুতি হচ্ছে এই যে এতে কিছু প্রতিক্রিয়াও

দেখা দেয়। প্রথম পর্যায়ে এই প্রতিক্রিয়া চিকিৎসার আয়ত্তে থাকে, কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে মারাত্মক আকার ধারণ করতে পারে।

যেহেতু পিলের উপাদান সমূহের সঙ্গে পূর্বে বর্ণিত স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধের অবিকল আণবিক সাদৃশ্য রয়েছে, সেহেতু এদের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও প্রায় একই রকমের। যেমন, ইস্ট্রোজেন বা প্রোজেস্টোরোনের একক বা মিশ্র ফর্মুলেশান সেবনে হাত-পা ফুলে যেতে পারে, দেহের জলীয় পদার্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে পারে, যা থেকে রক্তচাপবৃদ্ধিও অস্বাভাবিক নয়। এছাড়া, বিষণ্নতা ও তৎসহ হার্টের অসুখ খুবই দেখতে পাওয়া যায়। সারা দেহে কালশিরা দেখা দেয়। দীর্ঘদিন পিল ব্যবহারে সবচেয়ে যে মারাত্মক অসুখটির উদ্ভব হতে পারে, তা হলো জরায়ু বা অন্য স্ত্রীঅঙ্গের ক্যানসার।

উপরি উক্ত সমস্যার জন্য আজ সারা বিশ্বে পিল কতটুকু প্রয়োজনীয় অথবা পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াবিহীন পিল উৎপাদন করা যায় কি না, তা নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষানিরীক্ষা চলছে। এই ধরনের ব্যাধি এড়ানোর প্রকৃষ্ট উপায় হচ্ছে পিল না খাওয়ানো অথবা কয়েক মাস বাদ দিয়ে দিয়ে খাওয়ার ব্যবস্থা দেওয়া।

যেসব ওষুধ স্বল্পকাল ব্যবহারে ক্ষতি হয় ঃ

আমরা এবং আমাদের আত্মীয়পরিজন বন্ধুবান্ধবেরা প্রায়শই ছোটখাটো অসুখবিসুখে আক্রান্ত হয়ে থাকি, যেসব অসুখের আয়ু এক থেকে দু সপ্তাহ পর্যন্ত। এমতাবস্থায় রোগ নির্মূল করার চেয়েও সময় সময় প্রয়োজন হয় রোগের লক্ষণভিত্তিক তাৎক্ষণিক চিকিৎসার। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে কেউ ঠান্ডা লাগিয়ে সর্দিকাশি দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন বা নির্দিষ্ট রুটিন-মাফিক খাওয়াদাওয়ার বাইরে অনিয়ম করে পেটের অসুখ বাধিয়েছেন বা কোন কারণে চোট পেয়ে ব্যথাবেদনা অনুভব করছেন। এহেন অবস্থায় ডাক্তারদের নির্দেশমতো বা ছাড়াই আমরা নিম্নলিখিত ওষুধগুলি খেয়ে থাকি। এসব ওষুধ ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়াই দোকানে কিনতে পাওয়া যায় বলে এদের বলা হয় 'ওভার-দি কাউন্টার ড্রাগ'।

ব্যথার ওষুধ ঃ

এ ধরনের ওষুধের উদাহরণ হচ্ছে অ্যানালজিন, অ্যাসপিরিন, ফেনিল বুটাজোন, অক্সিফেন বুটাজোন, ব্রুফেন, বুটাপ্রক্সিভন ইত্যাদি। প্রথমেই জানাই, ব্যথা কমানোর প্রতিটি ওষুধেরই কয়েকটি গুরুতর পার্শ্ব-

প্রতিক্রিয়া আছে। যেমন, পাকস্থলীর প্রদাহ, পাকস্থলী থেকে রক্তক্ষরণ, রক্ত ও রক্তসৃষ্টিকারী অস্থিমজ্জার শ্বেত কণিকার সংখ্যা হ্রাস, দেহে অধিক জল জমে হাত-পা ফুলে যাওয়া, হৃদযন্ত্র ও কিডনী ক্ষতিগ্রস্ত হওয়া প্রভৃতি। এ ধরনের ওষুধের মধ্যে অ্যাসপিরিন ও এই গোত্রের ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া তুলনামূলকভাবে কম এবং ব্যথা কমানোর ক্ষমতাও বেশী। অন্যান্য ওষুধ যেমন অ্যানালজিন, ফেনিল ও অক্সিফেন বুটাজোন ইত্যাদির ব্যথা কমানোর ক্ষমতা বেশী একথা প্রমানিত নয় এবং এরা অস্থিমজ্জার ক্ষতি ও অন্যান্য পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার বেশী উদ্ভব ঘটায়। অন্যান্য দেশে এজন্য এসব ওষুধের ওপর সতর্কতা আরোপ করা হয়, অ্যানালজিন অনেক পাশ্চাত্য দেশে মেলেই না। অথচ মজার কথা এই যে **অ্যানালজিন ভারতে নিষিদ্ধ তো নয়ই, বরং ভারত সরকারের একটি সংস্থাই এর অন্যতম প্রস্তুতকারক।**

1977 সালে বিশ্বব্যাপী বিভিন্ন সংস্থার উদ্যোগে একটি সমীক্ষা হয়েছিলো, যার উদ্দেশ্য ছিলো এই ব্যথাহর ওষুধগুলি কতটা ক্ষতিকর তার পরিসংখ্যান সংগ্রহ ও তা পর্যালোচনা করা। এই সমীক্ষার রিপোর্টে দেখা যায়, সমস্ত বিশ্বেই এসব ওষুধ অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে ব্যবহৃত হয় এবং অনেক দেশে ডাক্তারের ব্যবস্থাপত্র ছাড়া এসব ওষুধ বিক্রি করা হয় না। অথচ ভারতে পানবিড়ির দোকানে পর্যন্ত ব্যথাহর ওষুধ পর্যাপ্ত মজুত থাকে এবং অসংখ্য মানুষ তা মুড়িমুড়কির মত কিনে খান।

সর্দিকাশির ওষুধ ঃ

এ ব্যাপারে প্রচলিত রসিকতাটি আশা করি সকলেরই জানাআছে। তা হলো, ওষুধ খেলে সর্দিকাশি এক সপ্তাহেই সেরে যায়, কিন্তু ওষুধ না খেলে সারতে সাতদিন লাগে। সর্দিকাশি মূলত ভাইরাসসৃষ্ট ব্যাধি এবং এখনও পর্যন্ত ভাইরাসের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন ওষুধ নেই। তবু এসবক্ষেত্রে অযৌক্তিকভাবে অ্যাণ্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়, তার সঙ্গে শুকনো কাশির দমক কমানোর জন্য কফ লিংকটাস আর বুকে জমা কফ তরলায়িত করে নিঃসরণ করার জন্য এক্সপেক্টোরেন্ট জাতীয় ওষুধের ব্যবস্থা দেওয়া হয়।

বাজারে কাশির ওষুধ রয়েছে—অ্যাভিল এক্সপেক্টোরেণ্ট, কোরেক্স, কস্কোপিন প্লাস, ডাইলোসিন এক্সপেক্টোরেণ্ট, ফেনসেডিল, গ্লিলিংকটাস, পিরিটন এবং আরও কত কী! প্রত্যেক কাশির সিরাপে রয়েছে মূলত তিনটি উপাদান—কাশিকে তরল করার জন্য অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড, মস্তিষ্কের কাশি

কেন্দ্রকে প্রশমিত করার জন্য কোডিন এবং অ্যাণ্টিহিস্টামিন জাতীয় কোন ওষুধ। অ্যাণ্টিহিস্টামিন ওষুধে স্নায়ুমণ্ডলী শিথিল হয়ে পড়ে, তার ফলে নিদ্রা আসে ও রোগী স্বাভাবিক কাজকর্ম করতে অক্ষম হয়ে পড়ে। উপরন্তু এ জাতীয় ওষুধ কফকে গাঢ় করে যন্ত্রণাদায়ক কাশির সৃষ্টি করে। কোডিন জাতীয় ওষুধেও নিদ্রালুতা হয় এবং দীর্ঘদিন ব্যবহারে নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়ার সম্ভাবনা দেখা দেয়। কোন কোন কাশির ওষুধে ক্লোরোফর্ম মেশানো থাকে, যা লিভারের মারাত্মক পচন ঘটায় এবং রোগী এক অসুখের উপশম লাভের বদলে জণ্ডিসে আক্রান্ত হয়ে পড়ে।

সম্ভবত আমরা অনেকেই জানি না, আমাদের প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে আজ সমস্ত রকম কাশির ওষুধ উৎপাদন ও বিক্রি আইন করে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অথচ ভারতে 1985 সালে কাশির সিরাপ বিক্রি হয়েছে 35 কোটি 20 লক্ষ টাকার!

সর্দির ক্ষেত্রেও অ্যাণ্টিহিস্টামিন জাতীয় ওষুধ (কয়েকটি বাজারী নাম—ক্যাপ্রামিন, কোসাভিল, ভিকোরিল ইত্যাদি) সাময়িক কাজ হয় বটে, তবে তন্দ্রাচ্ছন্নতার ফলে গাড়ী চালানো, মেশিন বা আগুনের সামনে কাজ করা বিপজ্জনক হয়ে পড়ে।

দাস্ত ও আমাশয়ের ওষুধ ঃ

– মনে করা হয় যে 'অম্বল বাঙালীর সম্বল'-এর মতই আমাশয়ও বাঙালীর জীবনে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত। অবশ্য শুধু বাঙালীই নয়, বোম্বাই ও অন্যান্য অনেক স্থানের বাসিন্দারাও এই অসুখে ভোগেন। দাস্ত ও আমাশয়ের প্রধান কারণই হলো দূষিত জল পান করা। দাস্তের হালফিল রেডিও, টিভি ও অন্যান্য গণমাধ্যমে নামকরণ হয়েছে 'আন্ত্রিক রোগ'। প্রায়শই শিশুরা এই রোগের শিকার হয় এবং সরকারী রিপোর্ট অনুযায়ী ভারতে প্রতি বছর 15 লক্ষ শিশু আন্ত্রিক রোগে মারা যায়।

আন্ত্রিক রোগে ওষুধের ভূমিকা কী? দেখা গেছে আন্ত্রিক রোগ বা পেটের অসুখের 50-60 শতাংশ ক্ষেত্রে দায়ী হলো বিশেষ ধরনের ভাইরাস। এছাড়া অ্যামিবা, জিয়ার্ডিয়া, কৃমি, জীবাণু, কিছু ওষুধ (টেট্রাসাইক্লিন, ম্যাগনেসিয়ামযুক্ত অ্যাণ্টাসিড) এবং মানসিক কারণেও পেট খারাপ হতে পারে। **অধিকাংশ পেটের অসুখই আপনা থেকেই সেরে যায়, কোন ওষুধের প্রয়োজনই হয় না।** ঘন ঘন দাস্তের ফলে দেহে লবণ-জলের ঘাটতি মেটাতে দাস্ত শুরুর

তের

পর থেকেই গ্লুকোজ-লবণ বা চিনি-লবণের সরবৎ ঘনঘন খাওয়ানোই পেটের অসুখের বিজ্ঞানসম্মত চিকিৎসা (আমাদের এক নম্বর পুস্তিকা 'পেটের অসুখ' দ্রষ্টব্য—সম্পাদক)।

পেটের অসুখ ও আমাশয়ে রকমারী ওষুধের ব্যবস্থা দেওয়া হয়, যাদের অনেকগুলির কার্যকরী ক্ষমতা সম্পর্কে প্রশ্ন আছে, কিন্তু দেহের ক্ষতি করার ক্ষমতা প্রমাণিত সত্য।

(ক) ক্লিওকুইনল—মেক্সাফর্ম, এণ্টেরোভায়োফর্ম, এণ্টেরোকুইনল এ গোত্রের ওষুধের কয়েকটি পরিচিত উদাহরণ। ক্লিওকুইনল প্রথম বাজারে আসে 1934 সালে সিবা-গাইগী কোম্পানীর মারফৎ। কিন্তু কয়েক বছর ব্যবহারের ফলে দেখা গেলো যে **এই জাতীয় ওষুধগুলি ক্রমশই দৃষ্টিশক্তি কমিয়ে দেয় ও পরবর্তীকালে অন্ধত্ব ও পক্ষাঘাত দেখা দিতে পারে।** কেবলমাত্র জাপানেই দশ হাজার রোগী অন্ধ ও পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়ে পড়েছে ক্লিওকুইনল খাওয়ার ফলে। পরবর্তীকালে নেপাল, বাংলাদেশ, পাকিস্তানসহ অন্যান্য দেশে এই ওষুধ বিক্রি সরকারীভাবে নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয় এবং আক্রান্ত রোগীদের ওষুধ কোম্পানী কর্তৃক ক্ষতিপূরণ প্রদানে বাধ্য করা হয়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় যে আন্তর্জাতিক মতামতের চাপে সিবা-গাইগী কোম্পানী নিজেরাই মেক্সাফর্ম উৎপাদন বন্ধ করে দিয়েছে। একথা আজ সর্বজন বিদিত এবং বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা দ্বারা অনুমোদিত যে আমাশয়ে ক্লিওকুইনলের চেয়ে মেট্রোনিডাজল-জাতীয় ওষুধ অনেক কার্যকরী ও নিরাপদ।

(খ) **ক্লোরামফেনিকল—স্ট্রেপ্টোমাইসিন মিশ্রণ ঃ** এই দুটি অ্যান্টি-বায়োটিকের মিশ্র ফর্মুলেশানটির কয়েকটি পরিচিত নাম হলো ক্লোরোস্ট্রেপ, এণ্টেরোস্ট্রেপ, ইনটেস্টোস্ট্রেপ, স্ট্রেপ্টোপ্যারাক্সিন। প্রথমেই বলে রাখি **এই ওষুধগুলির পেটের অসুখ বা আমাশয় বন্ধে কোন ভূমিকাই নেই।** যেহেতু উভয়েই জীবাণুনাশী অ্যান্টিবায়োটিক, তাই ভাইরাস ও জিয়ার্ডিয়াজনিত পেটের অসুখে কোন কাজই করে না। স্ট্রেপ্টোমাইসিন মুখে খাওয়ালে তা কখনই অন্ত্রে অবস্থিত ঝিল্লীদ্বারা শোষিত হতে পারে না, এবং এই ওষুধ মুখে খাওয়ানো যেতে পারে বলে কোনো বইয়ে লেখা নেই। আর ক্লোরামফেনিকল মারাত্মক কয়েকটি পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে, যার অন্যতম হলো অস্থিমজ্জায় রক্তকোষ তৈরি বন্ধ করে দেওয়া। হাড়ের মজ্জার ওপর ক্ষতিকর প্রভাবে আক্রান্ত ব্যক্তি পরবর্তীকালে রক্তের ক্যানসারে আক্রান্ত হতে পারে। এছাড়া, অপ্রয়োজনে ও

অনিয়মিতভাবে অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করলে এগুলি পরে আর নির্দিষ্ট জীবাণুর বিরুদ্ধে ততটা ক্রিয়াশীল থাকে না।

(গ) **সালফাজাতীয় ওষুধ :** উদাহরণ সালফাগুয়েনিডিন, সালফা-থালাজল। মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে কিংবা অতিসংবেদনশীল রোগীর ক্ষেত্রে সালফামিশ্রিত ওষুধ অ্যালার্জির সৃষ্টি করতে পারে। তাছাড়া এই ওষুধ রক্তের দানাযুক্ত শ্বেত কণিকার সংখ্যা কমিয়ে দিতে এবং লিভার ও কিডনির ক্ষতি করতে পারে।

(ঘ) **দাস্ত কমায় যেসব ওষুধ :** লোমোটিল, লোমোফেন, আইমোজেক ইত্যাদি। পেটের অসুখের মূল কারণকে বিনাশ করাই হলো যুক্তিযুক্ত চিকিৎসা। উপরোক্ত ওষুধ দ্বারা চিকিৎসাকে বলে লক্ষণভিত্তিক চিকিৎসা। এই ওষুধগুলি ক্রমশ অন্ত্রের গতিবেগ কমিয়ে দেয়, যার ফলে অন্ত্রে জমা মল শরীর থেকে বেরোতে পারে না। জীবাণুগুলি ক্রমাগত অন্ত্রে বংশবৃদ্ধি করে চলে, ফলে রোগের স্থায়িত্ব বেড়ে যায়। এছাড়া এসব ওষুধে মরফিনজাতীয় ওষুধের আণবিক সাদৃশ্য থাকায় এরা শরীরে মরফিনজাতীয় ওষুধের কমবেশী পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।

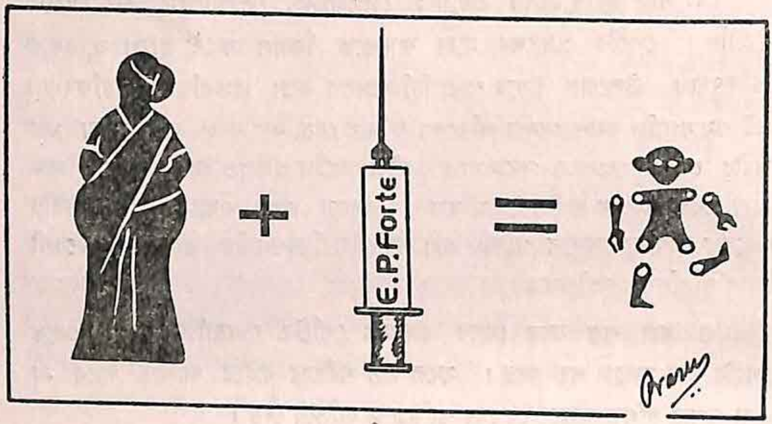
(ঙ) **মল শক্ত করে যেসব ওষুধ :** পেক্টিন, কেয়োলিন ইত্যাদি ওষুধ পেটের জমা মলকে শক্ত করে। ফলে মল শরীরের বাইরে আসতে পারে না এবং ওপরে বর্ণিত কারণে রোগের স্থায়িত্বকে বাড়িয়ে দেয়।

অ্যানাফাইল্যাক্সিস সৃষ্টিকারী ওষুধ :

কিছু ওষুধ প্রয়োগের সঙ্গে সঙ্গে কোন কোন ব্যক্তির সাংঘাতিক প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। এই প্রতিক্রিয়াকে অ্যানাফাইল্যাক্সিস বলে। এই অবস্থার ত্বরিত প্রতিবিধান না করলে রোগীর মৃত্যু ঘটে। পেনিসিলিন, ওম্‌নামাইসিন প্রভৃতি ওষুধে অ্যানাফাইল্যাক্সিস হতে পারে। ইনজেকশান দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে কপালে ঘাম জমতে থাকে, হাত-পা শীতল হয়ে আসে নাড়ী ছেড়ে যায়, রক্তচাপ অত্যন্ত নেমে যায়, দেহে লাল চাকা চাকা দাগসহ ভীষণ শ্বাসকষ্ট হয়। অবিলম্বে ত্বকের নীচে অ্যাড্রিনালিন ইনজেকশান ও অন্যান্য ব্যবস্থা না নিলে রোগী মারা যায়। এজন্য পেনিসিলিন জাতীয় ইনজেকশান কেবল ডাক্তাররাই দেবেন বা ডাক্তারের উপস্থিতিতে দিতে হবে। সংশ্লিষ্ট ওষুধটি ইনজেকশান দেওয়ার আগে অনেকে অল্পমাত্রায় ত্বকের নীচে দিয়ে দেখেন রোগীর কোন প্রতিক্রিয়া হয় কি না।

গর্ভসঞ্চার নির্ণয় করার ওষুধ ঃ

ইস্ট্রোজেন ও প্রোজেস্টেরোনের বেশী মাত্রার মিশ্রণ কয়েকটি (বাজারী নাম ই. পি. ফোর্ট, মেনস্ট্রোজেন ফোর্ট, ওরাসেক্রন ফোর্ট) গর্ভসঞ্চার ঘটেছে কি না তা নির্ণয়ের ওষুধ হিসেবে ষাটের দশকে বাজারে আসে। কিন্তু অল্প কয়েক বছরেই প্রমাণিত হয় যে অন্তত 20 শতাংশ ক্ষেত্রে এই পরীক্ষা ভুল ফল দেয়। তার থেকে মারাত্মক হলো, **যেসব মহিলাকে এসব ওষুধ দেওয়া হয়, তাদের অনেকের সন্তান বিকলাঙ্গ হয়ে জন্মায়।** এই পর্যবেক্ষণের ফলে এ ধরনের



অপ্রয়োজনীয় এবং ক্ষতিকারক ওষুধ গর্ভস্থ শিশুকে বিকলাঙ্গ করে।

ওষুধ ইউরোপসহ সমস্ত উন্নত রাষ্ট্রে আইন করে নিষিদ্ধ করা হয়। আমাদের দেশে বছর কয়েক আগে (31 মার্চ, 1983) এই ওষুধ নিষিদ্ধ হয়, কিন্তু কয়েকটি বহুজাতিক সংস্থা আদালত থেকে এই নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ পায় এবং প্রচুর উপঢৌকন ও উৎকোচের সাহায্যে আজও এগুলি চালু রেখেছে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, গর্ভসঞ্চার পরীক্ষার জন্য এসব বিষাক্ত হরমোন ওষুধ খাওয়ার দরকার নেই। কোন মহিলার প্রস্রাব পরীক্ষা করে অল্প সময়ে জানা সম্ভব তিনি গর্ভবতী কি না।

যেসব ওষুধ বিভিন্ন দেহাংশের ক্ষতি করে ঃ

প্রথমেই আসি হার্ট বা হৃদযন্ত্রের কথায়। হার্টের অসুখে ব্যবহৃত হয় এমন কয়েকটি ওষুধ চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া নিতান্ত অসাবধানে ব্যবহার

করলে হার্টের উপকারের বদলে ক্ষতি সাধন করে। যেমন ধরা যাক, বিগত দুশো বছর ধরে যে ওষুধটি ব্যবহৃত হয়ে আসছে সেই ডিজিটালিসের কথা। এই ওষুধটি হৃদযন্ত্রের বৈকল্যের অব্যর্থ ও একমাত্র নির্দিষ্ট ওষুধ, যা অতিরিক্ত সেবনে হৃদযন্ত্রের স্পন্দন মন্থর থেকে মন্থরতর হয়ে একসময় থেমে যেতে পারে। তাছাড়া হৃদস্পন্দনের যে নির্দিষ্ট ছন্দ রয়েছে, তার ব্যত্যয় ঘটিয়ে এক বিপজ্জনক অবস্থার সৃষ্টি করতে পারে যা কখনও কখনও চিকিৎসার আয়ত্তের বাইরে চলে যায় ও রোগী মারা যায়।

এছাড়া কয়েকটি ওষুধ আছে, যা অন্যান্য অসুখে দেওয়া হয়, কিন্তু হৃদযন্ত্রের ওপর সেগুলির পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া আছে। যেমন ম্যালেরিয়ায় ব্যবহৃত ওষুধ কুইনিন ও ক্লোরোকুইন এবং আমাশয়ে ব্যবহৃত এমিটিন। এই ওষুধগুলির অধিক প্রয়োগে হার্টের ধড়ফড়ানি বাড়তে পারে বা স্পন্দন মন্থর থেকে মন্থরতর হতে পারে।

চিকিৎসা শাস্ত্রে কয়েকটি ওষুধ ব্যবহৃত হয়, যা আমাদের যকৃতের পক্ষে ক্ষতিকর। এটা জেনে রাখা প্রয়োজন যে শুধুমাত্র অ্যালকোহলই আমাদের যকৃৎকে নষ্ট করে না, অনেক অতি প্রয়োজনীয় জীবনদায়ী নিত্যব্যবহৃত ওষুধও যকৃতের সাধারণ কর্মক্ষমতার হ্রাস ঘটায়। এর ফলে রোগীর জন্ডিস দেখা দেয় এবং ক্রমে যকৃৎ সম্পূর্ণ বিকল হয়ে রোগী চৈতন্য হারাতে পারে ও তার মৃত্যু ঘটতে পারে। অবশ্য দেহ সকল রকম ওষুধ বা রাসায়নিক পদার্থ যকৃৎ মারফৎ নিস্ক্রিয় করে। তবে কোন কোন ক্ষেত্রে যকৃৎ আগে থেকেই আংশিক খারাপ থাকলে সেসব রোগীকে কোন ওষুধ প্রয়োগের আগে খেয়াল রাখতে হবে তা যকৃতের আরও ক্ষতি করবে কি না। উদাহরণ হিসেবে প্রথমে উল্লেখ করতে হয় গর্ভনিরোধক পিলের কথা, যা দীর্ঘদিন ডাক্তারের পরামর্শ ছাড়া সেবন করা বিপজ্জনক। এছাড়া আছে যক্ষ্মার ওষুধ আইসোনিয়াজিড্ এবং রিফাম্পিসিন। অতীতে বহুল ব্যবহৃত সংজ্ঞাহরণকারী ওষুধ ক্লোরোফর্ম আজ এই কারণেই আর ব্যবহার করা হয় না। কিছু মানসিক ব্যাধি নিরসনের ওষুধ যকৃতের পক্ষে ক্ষতিকারক। এগুলি হলো ফেনোথায়াজিন-গোত্রীয় ওষুধ, যেমন মেলেরিল, এংকাজিন ইত্যাদি। অতএব এসব ওষুধ সম্ভাব্য যকৃতের রোগীর ক্ষেত্রে বর্জন করা উচিত। একান্তই প্রয়োজন হলে সতর্কতার সঙ্গে প্রয়োগ করতে হবে এবং মাঝে মধ্যে যকৃতের সাধারণ কর্মক্ষমতার পরিমাপ করে নিতে হবে।

কয়েকটি বহুল প্রচলিত ওষুধ আমাদের দেহের অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র

সত্যের

কিড্‌নী বিনষ্ট করে দেওয়ার ক্ষমতা রাখে। প্রাক-অ্যাণ্টিবায়োটিক যুগে প্রচুর পরিমাণে সালফোনামাইড-জাতীয় ওষুধ ব্যবহৃত হতো, আজকালও কিছু কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়। এই সালফোনামাইড কোন কোন রোগীর প্রস্রাবে স্ফটিকাকার দানার পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়। তার ফলে রোগী প্রস্রাব নিঃসরণে জ্বালা যন্ত্রণা অনুভব করে, কখনো কখনো প্রস্রাবের সঙ্গে রক্তপাতও ঘটতে পারে। এই প্রতিক্রিয়া এড়াতে হলে **সালফাজাতীয় ওষুধ খেলে প্রচুর পরিমাণে জল খেতে হয়।** অ্যামিনোগ্লাইকোসাইড গোত্রের কিছু অ্যাণ্টিবায়োটিক যেমন স্ট্রেপ্টোমাইসিন, জেণ্টামাইসিন, নিওমাইসিন, টোব্রামাইসিন ইত্যাদি, অতিরিক্ত ব্যবহারে কিডনীর পরিমণ্ডলীয় অংশে পচন ঘটিয়ে কিডনী সম্পূর্ণ বিকল করে দিতে পারে।

ওষুধ দ্বারা আক্রান্ত হয় অন্য যে দেহাংশটি, তা হল চোখ। আজ থেকে একশ বছর আগে ম্যালেরিয়ার ওষুধ কুইনিন খেয়ে অনেকে অন্ধ হয়ে যাওয়ার ঘটনা চিকিৎসাশাস্ত্রের এক অন্ধকার অধ্যায়। কুইনিন ও ক্লোরোকুইন জাতীয় ওষুধ চোখের ভেতরের পর্দা রেটিনাতে স্তরে স্তরে জমে যায়, রোগী চোখে ঝাপসা দেখতে শুরু করে এবং সময়ে সতর্ক না হলে অল্পদিনের মধ্যেই অন্ধত্ব প্রাপ্ত হয়। অনুরূপভাবে চোখের ক্ষতি করে যক্ষার বহুল প্রচলিত ওষুধ ইথামবিউটল, যা ধীরে ধীরে চোখের স্নায়ুকে অবশ করে দেয়। হার্টের রোগের ওষুধ ডিজিটালিসও দীর্ঘদিন সেবনে রেটিনার ক্ষতি করে বলে জানা গেছে।

এবারে আলোচনা করা যাক ওষুধ থেকে সৃষ্ট মানসিক তথা স্নায়বিক রোগের ঘটনা। মানসিক রোগ প্রসঙ্গে আমি তিন ধরনের ওষুধজানত রোগের কথা বলবো। প্রথম পর্যায়ে পড়ে কতকগুলি ওষুধ যা সেবনে সাময়িকভাবে মানসিক উৎফুল্লতা দেখা দেয়। যেমন স্টেরয়েড, যা মনের এক বিশেষ অবস্থার সৃষ্টি করে, যাকে বলা হয় 'স্টেরয়েড সাইকোসিস'। এছাড়াও অনুরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয় অ্যামফিটামিন জাতীয় ওষুধ থেকে, যা ক্ষিদে কমানো ও মেদবৃদ্ধি প্রতিরোধের ওষুধ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। দ্বিতীয় বিভাগে আছে কয়েকটি ওষুধ, যা ক্রমাগত সেবনে নেশার সৃষ্টি হয়। নেশা অর্থে রোগী বিশেষ সময়ে ঐ ওষুধটি না পেলে বিশেষ ধরনের মানসিক কষ্ট অনুভব করে যা কেবল তৎক্ষণাৎ ঐ ওষুধ প্রয়োগেই নিবারিত হয়। এই ঘটনাকে বলে ওষুধ নির্ভরতা বা 'ড্রাগ ডিপেনডেন্স'। যতক্ষণ এই কষ্ট কেবল মানসিক স্তরে থাকে, তাকে বলা হয় 'মানসিক নির্ভরতা', এবং যখন ঐ ওষুধের অভাবে রোগী শারীরিক কষ্ট অনুভব করতে থাকে, তখন বলা হয় 'দৈহিক নির্ভরতা'।

এই ধরনের উদাহরণ হলো মরফিন, পেথিডিন, হিরোইন প্রভৃতি। তৃতীয় পর্যায়ে কয়েকটি ওষুধের কথা বলবো, যেগুলি স্নায়বিক বৈকল্য সৃষ্টি করে। এ প্রসঙ্গে ফেনোথায়াজিন (বাজারী নাম এস্কাজিন, ট্রাজিন ইত্যাদি), হ্যালোপেরিডল (বাজারী নাম সেরিনাস, ডোপিডল, এসিডল ইত্যাদি) প্রভৃতি ওষুধজাত হাত-পায়ের কাঁপুনি, মাংসপেশী শক্ত হয়ে যাওয়া, এবং যক্ষার ওষুধ আইসোনিয়াজিড-জাত হাত-পায়ের ঝিন্‌ঝিন্‌ ভাব ও খিঁচুনী বিশেষভাবে উল্লেখের দাবী রাখে।

গর্ভাবস্থায় ওষুধ সেবন ঃ

চিকিৎসা বিজ্ঞানে এমন কোনও ওষুধ বা রাসায়নিক পদার্থ নেই, যা গর্ভবতী মায়ের জরায়ু অতিক্রম করে ভ্রূণের দেহে প্রবেশ করে না। এমতাবস্থায় প্রযুক্ত ওষুধ মায়ের ক্ষতির চেয়েও গর্ভস্থ ভ্রূণের কতটা ক্ষতি করে, তাই সবিশেষ বিবেচনার বিষয়। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে **গর্ভাবস্থার প্রথম তিন মাসে ওষুধপত্র খাওয়া খুবই বিপজ্জনক**, এবং নিতান্ত প্রয়োজনে কেবলমাত্র ডাক্তারী ব্যবস্থা ছাড়া কোন ওষুধই এই সময়ে খাওয়া উচিত নয়। কারণ এই সময়েই ভ্রূণের কোষ বিশেষীকরণ ও বিভাজন এবং ভ্রূণের লিঙ্গ নির্ধারণ হয়ে থাকে। এই সময়ে কোষের বিভাজন কমায় বা কোষের মৃত্যু ঘটায় এমন কোন ওষুধ, যেমন ক্যানসারে ব্যবহৃত মিটোমাইসিন, নাইট্রোজেন মাস্টার্ড, মাইলেরান প্রভৃতি, কিছু অ্যান্টিবায়োটিক অত্যন্ত বেশী মাত্রায়, মৃগী রোগের ওষুধ ডাইলানটিন, থাইরয়েডের ওষুধ থায়োইউরাসিল এবং ক্যানসার চিকিৎসায় রঞ্জন রশ্মি, প্রয়োগ করলে গর্ভস্থ শিশুকে বিকলাঙ্গ করে দিতে পারে। গর্ভ নির্ণয়ের জন্য বেশী মাত্রার ইস্ট্রোজেন—প্রোজেস্টেরোন বড়ি সেবনেও গর্ভস্থ শিশু বিকলাঙ্গ হতে পারে, একথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দু দশক আগেকার থ্যালিডোমাইড বিপর্যয়ের কথা স্মরণ করা যেতে পারে। এই ওষুধটি ঘুমের বড়ি হিসেবে বাজারে ছেড়েছিলো জার্মানীর এক কোম্পানী। যেসব অন্তঃসত্ত্বা মহিলা এই ওষুধটি সেবন করেছিলেন, তাদের সন্তানেরা ভূমিষ্ঠ হয়েছিলো হাত-পায়ের বিকলাঙ্গতা নিয়ে। অবশ্য তার পরেই সারা বিশ্বে ওষুধটি নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়।

প্রোজেস্টেরোন হরমোন (বাজারে মেলে ডুফাস্টন, জেস্টানিন ইত্যাদি নামে) পর পর গর্ভপাত হয়েছে, এমন অনেক মহিলার গর্ভপাত রোধ করতে দেওয়া হয়ে থাকে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে প্রমাণিত হয়েছে যে এই

হরমোন গর্ভস্থ স্ত্রীভ্রূণের লিঙ্গ পরিবর্তন করে আংশিক পুংলিঙ্গে পরিণত করে।

ওষুধ ও গর্ভাবস্থা বিষয়ক আলোচনা শেষ করবো একটি অতি পরিচিত ওষুধের উদাহরণ দিয়ে। টেট্রাসাইক্লিন নামক এ্যান্টিবায়োটিকটি চিকিৎসকেরা প্রায়শই ব্যবহার করেন। সদ্যোজাত বা অতি অল্পবয়স্ক শিশুকে এটি খাওয়ালে শিশুর কচি হাড়ে ও সদ্যোত্থিত দাঁতে জমতে থাকে এবং তার ফলে হাড় ও দাঁতের বৃদ্ধি ব্যাহত হয়। এই পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার জন্যই আজ টেট্রাসাইক্লিন সিরাপ ভারতেও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

যে সমস্ত শিশুরা স্তন্যপান করে, তাদের মায়েরা যদি বিশেষ কিছু ওষুধ (মরফিন, পেথিডিন, গার্ডিনাল, অ্যাসপিরিন ইত্যাদি) সেবন করেন, তবে সেই ওষুধ মাতৃদুগ্ধে নিঃসৃত হয় এবং উক্ত ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া ঐসব শিশুদের ওপরও বর্তায়।

প্রতিরোধের উপায় ঃ

ক) চিকিৎসকের ভূমিকা— রোগ নির্ণয়ে চিকিৎসকের ভুল হতেই পারে, কিন্তু ভুল ওষুধ প্রয়োগ করে রোগীর ভোগান্তি ঘটানো তার পক্ষে সমীচীন নয়। অর্থাৎ যে সব ওষুধে গুরুতর পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হতে পারে, চিকিৎসক সেগুলি লিখবেন না, এবং ক্ষেত্রবিশেষে লিখতে বাধ্য হলে তার সম্ভাব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে সতর্ক থাকবেন। এছাড়া ওষুধ কোম্পানীর প্রচার কৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে অবৈজ্ঞানিক মিশ্র ওষুধ লেখা থেকে চিকিৎসকদের বিরত থাকতে হবে।

খ) চিকিৎসাকর্মীর ভূমিকা - এদেশে ডিগ্রিধারী শিক্ষিত চিকিৎসক ছাড়াও বহু অশিক্ষিত হাতুড়ে চিকিৎসক গ্রামে ও শহরে ব্যবসা করেন। এসব হাতুড়ে চিকিৎসকেরা মেডিক্যাল কাউন্সিল ও সরকারের স্বাস্থ্য বিভাগের কোনরকম অনুমোদন ছাড়াই সম্পূর্ণ বেআইনী ও অবৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে রোগীর চিকিৎসা করে থাকেন। তারা অযৌক্তিক ওষুধ কম বা বেশী মাত্রায় রোগীর ওপর প্রয়োগ করেন। উদাহরণ স্বরূপ বলি—আমার পরিচিত কয়েকজন ব্যক্তিকে দেখেছি, যারা এ ধরনের চিকিৎসকদ্বারা কঠিন হাঁপানী অসুখের চিকিৎসা করান। এদের আপাতদৃষ্টিতে সুস্থ মনে হলেও দেখেছি এরা অজান্তে স্টেরয়েড জাতীয় ওষুধ সেবন করে থাকেন, যার ফলশ্রুতিতে (1) রোগীর রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা একেবারে বিনষ্ট হয়ে যায় এবং (2) সারা

শরীর ফুলে যায় ও অবাঞ্ছিত অন্য রোগ, যথা ডায়াবেটিস, রক্তচাপ বৃদ্ধি ইত্যাদি অসুখের সৃষ্টি হয়।

এ প্রসঙ্গে আমার বক্তব্য এই যে জনসাধারণের উচিত এসব চিকিৎসককে চিহ্নিত করা, সামাজিকভাবে বয়কট করা এবং সম্ভব হলে এদের ভুয়ো সার্টিফিকেটের উৎসস্থলের ঠিকানা সরকারকে জানানো।

গ) ওষুধ কোম্পানীর ভূমিকা - ওষুধ কোম্পানীগুলিকে একথা মনে রাখতে হবে যে তাদের একটা সামাজিক দায়বদ্ধতা আছে, জনগণের আর্তি নিয়ে নির্বিবেক ব্যবসা করলে তাদের চলে না। প্রতিটি কোম্পানীকেই এ বিষয় নিশ্চিত করতে হবে যে তাদের তৈরি যে সব ওষুধ বাজারে ছাড়া হয়েছে, সেগুলির গুণগত মান এবং পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার যথাযথ পরীক্ষা করা হয়েছে। অনেক বহুজাতিক কোম্পানী তাদের অনেক ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়ার কথা তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলির চিকিৎসকদের ঠিকমতো জানায় না। ওষুধ কোম্পানীগুলির অবশ্যকর্তব্য হচ্ছে তাদের তৈরি প্রতিটি ওষুধের বিস্তারিত বিবরণ চিকিৎসকদের জানানো।

ঘ) সরকারের ভূমিকা— ওষুধজনিত অসুখ প্রতিরোধে সরকারের ভূমিকাই সর্বপ্রধান। প্রতিটি দেশেরই নিজস্ব এক জনমুখী জাতীয় ওষুধ নীতি থাকা উচিত। এই নীতি নিশ্চিত করবে অল্প দামে জীবনদায়ী নিরাপদ ওষুধের পর্যাপ্ত প্রাপ্তি। প্রতিটি দেশী ও বিদেশী ওষুধ নির্মাতাদের ওপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ পর্যাপ্ত ও কঠোর হওয়া প্রয়োজন। সরকারী সহযোগিতায় একটি ওষুধ-বিষয়ক তথ্যকেন্দ্র চালু হওয়া উচিত, যার মাধ্যমে চিকিৎসক তথা জনগণ ওষুধ সম্পর্কে প্রকৃত তথ্যাদি জানতে পারবেন। সঠিক রোগে সঠিক ওষুধ যথাযথভাবে প্রযুক্ত হচ্ছে কিনা, তা পর্যালোচনার জন্য প্রতি হাসপাতালে একটি কমিটি থাকা প্রয়োজন।

ওষুধজনিত অসুখ নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারের করণীয় বিষয়গুলি সম্পর্কে আমি কয়েকটি প্রস্তাব রাখছি—

1. দেশের প্রতিটি নাগরিককে সুচিকিৎসার সুযোগ দিতে একটি জনমুখী স্বাস্থ্যনীতি ও ওষুধনীতি প্রবর্তন করতে হবে।
2. ডাক্তারী প্র্যাক্টিস সম্পূর্ণ সরকারী নিয়ন্ত্রণাধীন করতে হবে। নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে প্রতিটি চিকিৎসককে বাধ্যতামূলক 'রিফ্রেশার্স' কোর্সে' অংশগ্রহণ করতে হবে।

3. সমস্ত হাতুড়ে এবং অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা আইন করে বন্ধ করতে হবে। কেবলমাত্র শিক্ষিত ডিগ্রিধারী চিকিৎসকেরাই রোগ নির্ণয় ও নিরাময়ের ব্যবস্থা করবেন।
4. চিকিৎসকের লিখিত নির্দেশপত্র ছাড়া ওষুধ বিক্রি হবে না। ওষুধের দোকানে পাশকরা ফার্মাসিস্ট নিয়োগ করতে হবে।
5. নিষিদ্ধ, অপ্রয়োজনীয় ও ক্ষতিকর ওষুধের উৎপাদন ও বিক্রি বন্ধ করতে হবে।
6. ভেজাল ওষুধের কারবারীদের শাস্তি দিতে হবে।
7. বিদেশী পুঁজি বাজেয়াপ্ত করে ওষুধ শিল্পের জাতীয়করণ করতে হবে। এবং
8. ওষুধ সম্পর্কে মিথ্যা প্রতিশ্রুতিভরা বিজ্ঞাপন, চিকিৎসকদের উপহার ইত্যাদি বিতরণ আইন করে বন্ধ করতে হবে।

জনস্বাস্থ্য প্রকাশন

(নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের একটি প্রকল্প)

157 সি, আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, (খান্না সিনেমা বিল্ডিং)
কলিকাতা 700006 (ফোনঃ 54-4659)

আমরা প্রকাশ করেছি ঃ

পেটের অসুখ (তৃতীয় সং)	ডাঃ তাপস সেন	দুই টাকা
অপুষ্টি (দ্বিতীয় সং)	ডাঃ গোপাল দাস	দুই টাকা
রোগ প্রতিরোধে টিকা (দ্বিতীয় সং)	ডাঃ সমীর কুন্ডু	দুই টাকা
এসব ওষুধ খাবেন না (দ্বিতীয় সং)	ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য	দুই টাকা
কৃমি সংক্রমণ (দ্বিতীয় সং)	ডাঃ সুব্রত ধর	দুই টাকা
রক্তাল্পতা (দ্বিতীয় সং)	ডাঃ কমলেশ দাস	দুই টাকা
জ্বর	ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল	দুই টাকা
কাশি	ডাঃ দুর্জয় দাস	দুই টাকা
প্রসঙ্গ ওষুধ	ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য	দুই টাকা
জলবাহিত রোগ	ডাঃ রণবীর পাল	দুই টাকা
মশকবাহিত রোগ	ডাঃ শতদল দাস	দুই টাকা
চিকিৎসা না বিভ্রান্তি ?	ডঃ পি জি. রায়	দুই টাকা
জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের রূপরেখা	শ্রী কালিদাস সমাজদার ও	
(দ্বিতীয় সং)	শ্রী বিশ্বজিৎ দত্তগুপ্ত	দুই টাকা
প্রসূতি পরিচর্যা	ডাঃ ধীমান মৈত্র	দুই টাকা
সুস্থভাবে বাঁচতে হলে	ডাঃ সুখময় ভট্টাচার্য	
(দ্বিতীয় সং)	ডাঃ কৃষ্ণ মিত্র ও	
	শ্রী প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়	তিন টাকা
মানসিক ব্যাধি	ডাঃ লালমোহন ঘোষ	আড়াই টাকা
ওষুধ থেকে অসুখ	ডাঃ কৃষ্ণাংশু রায়	আড়াই টাকা

- দুই মাস পর পর নতুন নতুন বিষয়ে আমাদের পুস্তিকা প্রকাশিত হয় এবং সকল প্রগতিশীল বইয়ের দোকানে পাওয়া যায় ।
- অন্তত 50 টাকা মূল্যের কমে ভি. পি. পি-তে বই পাঠানো হয় না । মোট মূল্যের অর্ধেক অগ্রিম পাঠাতে হয় । 1000 টাকাবা তদূর্ধ মূল্যে $33\frac{1}{3}\%$, 500 টাকার উর্ধে 30% 300 টাকার উর্ধে 25% এবং 100 টাকার উর্ধে 15% কমিশান দেওয়াহয় ।

OSUDH THEKE ASUKH □ মূল্য -2.50 টাকা

লেখক পরিচিতি : ডাঃ কৃষ্ণাংশু রায় একজন ভেষজবিশেষজ্ঞ শিক্ষক ও চিকিৎসক, এবং জনস্বাস্থ্য আন্দোলনের একজন উৎসাহী কর্মী।

যাঁদের শুভেচ্ছা আমাদের যাত্রা সুগম করেছে

মুখ্যমন্ত্রী শ্রী জ্যোতি বসু, শ্রী রামনারায়ন গোস্বামী, শ্রী অম্বরীশ মুখোপাধ্যায়, শ্রী নেপাল মজুমদার, ডাঃ ধীরেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রী কমল বসু, শ্রী গোপাল হালদার, ডাঃ ভাস্কর রায় চৌধুরী, শ্রী অন্নদাশঙ্কর রায়, প্রয়াত ডাঃ বিজয় কুমার বসু, শ্রী পান্নালাল দাসগুপ্ত, ডাঃ বৈদ্যনাথ চক্রবর্তী, ডঃ বাসন্তীদুলাল নাগচৌধুরী, বিচারপতি জ্ঞানধীর শর্মাসরকার, শ্রী হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক ব্রজগোপাল মুখোপাধ্যায় এবং চেনা-অচেনা বন্ধু ও শুভানুধ্যায়ীবৃন্দ।

1988 সালের সহযোগী সদস্য চাঁদা 15 টাকা। "Norman Bethune Janaswasthya Andolan" এই নামে মানি অর্ডার, ব্যাঙ্ক ড্রাফ্‌ট্ অথবা চেকে টাকা পাঠাবেন। মানি অর্ডার কুপনে পুরো নাম ঠিকানা অবশ্যই লিখবেন।

যোগাযোগের ঠিকানা :

কর্মসচিব
নর্মান বেথুন জনস্বাস্থ্য আন্দোলন
ইউনিভার্সিটি কলেজ অফ মেডিসিন
244-বি, আচার্য জগদীশ চন্দ্র বসু রোড
কলিকাতা-700 020 (ফোন : 28-9646)

'জনস্বাস্থ্য প্রকাশন'-এর পক্ষে ডাঃ জ্ঞানব্রত শীল কর্তৃক প্রকাশিত এবং বেঙ্গল জব প্রেস 1/5/1এ, প্রেমচাঁদ বড়াল ষ্ট্রীট, কলিকাতা-700012 হইতে মুদ্রিত।